সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

রোখসানা চৌধুরী

সেলিনা হোসেন বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহী শহরে। পিতা এ কে মোশারফ, মাতা মরিয়ম উন নেসা বকুল। পিতার জন্মসূত্রে রাজশাহীতে বেড়ে উঠলেও তাঁর আদি বাড়ি নোয়াখালী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমিতে গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমিতে পরিচালক পদে যোগদান করে ২০০৪-এ অবসর গ্রহণ করেন। নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলা একাডেমির পরিচালক হন। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বাংলা একাডেমি, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বাংলাদেশের প্রায় সব কটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও পদক লাভ করেছেন সেলিনা হোসেন। ২০১৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করে। তাঁর উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভারত, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে তাঁর রচিত উপন্যাস পাঠক্রমভুক্ত হয়েছে। সেলিনা হোসেনের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ৪৩। তবে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা প্রায় শতাধিক। তাঁর প্রায় সব রচনার মূলমন্ত্র স্বদেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় ও শোষিত জনগোষ্ঠী।

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই তিনি লিখেছেন গোটাদশেক উপন্যাস, অসংখ্য ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। এই লেখায় তাঁর রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর সাতটির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে। উপন্যাসগুলো হলো–

১. হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬)
২. যুদ্ধ (১৯৯৮)
৩. কাঠ কয়লার ছবি (২০০১)
৪. ঘুমকাতুরে ঈশ্বর (২০০৪)
৫. মাটি ও শস্যের বুনন (২০০৭)
৬. দিনের রশিতে গিটঠু (২০০৭)
৭. গেরিলা ও বীরাঙ্গনা (২০১৪)

জনজীবনে ইতিহাসের চাইতে সাহিত্যের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। তাই শিল্পভাষ্যের মাধ্যমে লেখক সেলিনা হোসেন এদেশে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের ভেতরকার সত্যকে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন সেই দেখা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনটি বিশেষ কোণ থেকে শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে এভাবে–

১. সর্বস্তরের লড়াই যার অপর নাম জনযুদ্ধ
২. সম্প্রদায় নয়, মুক্তিযুদ্ধ সর্বজনীন বাঙালির যুদ্ধ
৩. নারীর বহুমাত্রিক যুদ্ধ অথবা স্বীকৃতির লড়াই

১.

জনযুদ্ধ অর্থ জনসাধারণ সমর্থিত ও অংশগ্রহণকৃত যুদ্ধ। ইতিহাস জানায়, এই সভ্য পৃথিবীতে একটি দিনের জন্যেও কখনো যুদ্ধ বন্ধ হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রশাসকবৃন্দ নিজেদের প্রতিহিংসা, লোভ মেটাতে জনগণকে ছুড়ে ফেলেছে ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচায়। এরিক মারিয়া রেমার্কের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'-এ দেখা যায়, দেশের যুবকরা বাধ্য হচ্ছে যুদ্ধে যেতে। সেই যুদ্ধ গৌরবের অনুভূতির পরিবর্তে তাদের দিয়েছে ক্লান্তি আর ঘৃণাবোধ। যুদ্ধ থেকে তারা ফিরেছে একরাশ হতাশা আর অর্থহীনতার বোধ সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সর্বার্থেই জনযুদ্ধ ছিল। দেশভাগের পরবর্তী সময় থেকেই ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভক্তির তিক্ত ফলাফল ভোগ করে আসছিল সাধারণ মানুষ।

উনিশ শ একাত্তর পর্যন্ত একটি দিনের জন্যেও বন্ধ ছিল না বৈষম্য-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর অসন্তোষ। এ ধরনের আন্দোলন-মিছিল স্লোগানে সর্বস্তরের মানুষের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ছিল বলেই মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল মাত্র নয় মাসে। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন বাহিনী ও নানা পর্যায়ের কর্মকর্তারা যোগদান করলেও সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ ছিল সাধারণ দরিদ্র মানুষের। ৭ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উত্তাল আহ্বান ছিল যার যা ছিল তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার। আপামর জনতা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তাই বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখা যায় নি।

মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছিল স্বাধীনতার প্রথম আনুষ্ঠানিক দলিল। অনেক বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা নিলেও আর্থিকভাবে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়েছিল নিজেদের টাকায়। তাজউদ্দিন আহমেদের দূরদর্শিতার কারণে মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসকদের দিয়েই দেশের প্রশাসন চালু করা সম্ভব হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সেলিনা হোসেনের ১৯৭৬ সালে লেখা প্রথম উপন্যাসেই (হাঙর নদী গ্রেনেড) জনযুদ্ধ চিত্রায়নের সার্থক রূপায়ণ পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে নেই কোনো রাজনৈতিক চরিত্র, সেনা কর্মকর্তা, কিংবা অসাধারণ কোনো ব্যক্তিত্ব। হলদীগাঁ নামে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম হওয়া বুড়ি নামের মেয়েটির শৈশব থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত বেড়ে ওঠা আর জীবনযাপনের অতি

সাধারণ বর্ণনা আছে এতে। বুড়ির বিয়ে হয় বিপত্নীক দুই পুত্রের বাবার সাথে। উপন্যাসের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত হলদীগাঁয়ের নিস্তরঙ্গ কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজের আবহমান ছবি তুলে ধরা হয়েছে। রাজনীতি, মিটিং-মিছিল, দাবি-দাওয়া এসব যেন শহুরে বিষয়, গ্রামজীবনের নিভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বহুদূরের প্রসঙ্গ।

উপন্যাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে শহর থেকে যুদ্ধ ক্রমশ গ্রামীণ জীবনকে আক্রান্ত করে। হতচকিত গ্রামবাসী বিষয়টা বুঝে উঠতে উঠতেই অনেকখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। গ্রামের সব যুবকের সাথে বুড়ির সৎ ছেলে সলিম-কলিম যুদ্ধে চলে যায়। বিশেষ পরিস্থিতিতে গ্রামের প্রতিবেশী দুই মুক্তিযোদ্ধার জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের বহু সাধনার কাঙ্ক্ষিত প্রতিবন্ধী পুত্রকে হায়েনার মুখে তুলে দেয় বুড়ি। সলিম-কলিম, বুড়ি কিংবা উপন্যাসে উল্লিখিত অন্য মুক্তিযোদ্ধারা কেউ ডিগ্রিধারী শিক্ষিত কিংবা রাজনীতি সচেতন চরিত্র নয়। কিন্তু এরাই একাত্তরের সিংহভাগ জনতা, যারা মাতৃভূমি বাঁচাতে নিত্যকার ঘর-গৃহস্থালি ফেলে কাস্তে-লাঙলের বদলে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। এই গল্পের আরেক ধরনের যোদ্ধার উপস্থিতি সম্পর্কে না বললেই নয়। বুড়ির বাল্যসখী নীরা ছিল বাউল দলের সদস্য। সারাদেশ ঘুরে দোতারা হাতে গান গাইত সে। গ্রামের রাজাকাররা তাকে প্রাণের হুমকি দিয়ে দোতারা কেড়ে নেয়, কারণ গানের ভেতর দিয়ে সে দেশমাতৃকার কথা বলছিল।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত বায়ান্নের ভাষা সংস্কৃতি বাঁচানোর লড়াইয়ের ধারাবাহিক ফলাফল। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাওয়া, ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করা, সবশেষে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে দেয় যুদ্ধটা কেবলই ভূমি দখলের নিমিত্তে ঘটে নি। একটি জাতির মস্তিষ্ককে ধৌতকরণের মাধ্যমে দাসে পরিণত করাটাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ হলে এত দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করা যেত না সম্ভবত, যদি না আব্দুল মান্নান আর আরজাতুন্নেসার মতো স্বেচ্ছাসেবকেরা কোনো প্রাপ্তির আশা না রেখে জনতার কাতার থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। কসবার কুল্লা পাথর এলাকার এই দুজন বাসিন্দা ইতিহাসস্বীকৃত চরিত্র। যুদ্ধের নয় মাস এই দুজন শহিদদের লাশ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে উপযুক্ত মর্যাদায় দাফন করেন। আব্দুল মান্নান এবং আরজাতুন্নেসার জন্য বহু শহিদের লাশ বেওয়ারিশ হয়ে যায় নি। লাশ ধোয়ানোর সেই চৌকি আজও ইতিহাসের স্বাক্ষ্য দেয়।

সেলিনা হোসেনের 'যুদ্ধ' উপন্যাসের মকবুল-ছহিতন চরিত্র দুটো এই ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত হয়েছে। যুদ্ধের সময় লাশ সংরক্ষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা জগৎজ্যোতি দাসের শহিদ হওয়ার নৃশংস ইতিহাস থেকে জেনেছি। সুনামগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি দাসকে হত্যার পর তাঁর পবিত্র মরদেহকে হানাদার পাকবাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় আজমিরিগঞ্জ বাজারের মাঝখানে গাছের সাথে পেরেক দিয়ে তিনদিন ধরে আটকে ঝুলিয়ে রাখে। অন্য মুক্তিযোদ্ধারা যাতে ভয় পেয়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়, সেজন্য তারা লাশের ওপরেই অকথ্য নির্যাতন চালায়।

'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর' উপন্যাসে নদীভাঙা মানুষের জীবনের দুঃখগাথা দিয়ে যে কাহিনির শুরু, সেইসব উপকাহিনির যোগসূত্র ঘটে একটি গণকবরের কাছে এসে। লেখক দেখাতে চান যে দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হয়ত যে কোনো উপায়ে আরো অধিক পুঁজি গড়তে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার জীবন বেছে নিয়েছে, যার ফলে দেশাত্মবোধ তাদের কাছে এখন লোকদেখানো আনুষ্ঠানিকতার নামান্তর। কিন্তু এই দেশেরই যেসব অতি সাধারণ জীবনযাপন করা মানুষের অবদানের কারণে একাত্তরে বিজয় এসেছিল, তাদের জন্য আজও স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের বোধে একাত্ম হওয়ার বিকল্প নেই। একতার শক্তিই পারবে মানবেতর জীবনযাপন করা এইসব মানুষের জীবনে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বয়ে এনে দিতে। আর নওরতন বেওয়া সেই মানুষ, যিনি পেরেছেন স্বদেশ ও স্বাধীনতার প্রতিকৃতিরূপে নিজেকে দশগ্রামের মানুষের কাছে দাঁড় করাতে। তাই তার বাড়িতে যারা আসে, তারা বলে, 'শহীদের লাগি মোরাই তো কাঁদুম। শহীদের লাগি কাঁদলে মাটি, আকাশ, বাতাস খুশি থাকবে। নইলে মোগ উপর গজব নামবে। মাটি ফুঁইসা উঠবে। নদীগর্ভে তলায়ে যাইবে। জলোচ্ছ্বাস মোগরে দুইয়া সাফ কইরা দিবে। আবার ফুঁইসা উঠবে। বজ্রপাত অইবে। মোগরে বেইমান বইলে গালি দিবে। মোরা ধ্বংস অইয়া যামু।'

একটি গণকবর, একটি গণহত্যা দিবস এবং স্মৃতিসৌধরূপী নওরতন বেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে, যে দেশের শেকড় 'একাত্তর' নামক একটি সময়ে প্রোথিত রয়েছে। শেকড়ে ফিরতে পারলে, নওরতন বেওয়ার মতো স্বাজাত্যবোধ আর স্বদেশপ্রেম ধারণ করতে পারলে অর্থনৈতিক মুক্তি অসম্ভব কিছু নয়। অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব হলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমবে, অনেক মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে উঠবে।

২.

সেলিনা হোসেনের মুক্তযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে বারবার যে সত্যটি ডকুমেন্টারি ফিকশনের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে তা হলো এই যুদ্ধের সর্বজনীনতা। সেই সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সবার নেতা। গুটিকয়েক বিভ্রান্ত মানুষ ছাড়া দল-মত, শ্রেণি-বর্ণ-পেশা-ধর্ম, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেদিন তাঁর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশদের মতোই।

'যুদ্ধ' উপন্যাসে দুটি সনাতনধর্মী পরিবারের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। প্রথম পরিবারটি নিখিলের, যার একমাত্র পুত্র দেবেশ ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয়েছিল, একমাত্র নাতি সুভাষ চলে গেছে মুক্তিযুদ্ধে। দেবেশের স্ত্রী সুষমা স্বামীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় এত বছর ধরে এয়োতি চিহ্নস্বরূপ সিঁদুর পরে আছে। বেঁচে থাকার প্রেরণা এই অপেক্ষার সিঁদুরও তাকে মুছে ফেলতে হয় পাক বাহিনীর রোষের ভয়ে। শুধু সুষমা নয়, দ্বিগুণ বয়সী শাশুড়ি সরলা, সদ্যবিবাহিত ননদ সরস্বতীরও সিঁদুর মুছে শাখা-পলা খুলে ফেলতে হয় স্বামী সন্তানদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। লেখক অসম্ভব স্পর্শকাতর ভঙ্গিতে সিঁদুর বিষয়টিকে সনাতনধর্মীদের নিগৃহীত

হওয়ার রক্তিম প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, হরিদাসীদের সিঁদুর কেবল স্বামীর মৃত্যুর কারণেই সেদিন মুছে যায় নি।

যে কোনো দেশেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার সংকট তৈরি হয়। আগেই বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়াটাই ছিল শত্রুপক্ষের বিশেষ কৌশল। তাই নিখিল নিজের টুপি পরে বন্ধু আব্দুর রহমানের পরামর্শে কলেমা শেখে, মসজিদে যায় নামাজ পড়তে। তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিখিল তার অকৃত্রিম বন্ধু আব্দুর রহমান আর প্রতিবেশী ওদুদসহ অসংখ্য মুসলিমকে বীভৎসভাবে নিহত হতে দেখে বুঝতে পারে– 'নিজের গোপন অঙ্গটি কেটে মুসলমান হলেও ওরা ওকে রেহাই দেবে না। সমস্যাটা হিন্দু বা মুসলমানের নয়। সমস্যা জয় বাংলার, সমস্যা যুদ্ধের এবং স্বাধীনতার। বুঝতে পারে এখন থেকে ও আর হিন্দু নয়, এখন থেকে ওকে আর মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে না। ও বাঙালি, এই পরিচয়ে ওকে হয় মরতে হবে নয় বাঁচতে হবে।'

ঠিক এরকমই জাতিগতভাবে বাঙালিত্বের পরিচয় দিয়েছিল সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষ। 'মাটি ও শস্যের বুনন' উপন্যাসে দেখা যায়, শ্যামল সবুজ ধমশর গ্রামে ভোর হয় গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে। খ্রিষ্টধর্ম অধ্যুষিত গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষদের জীবন নারকীয় হয়ে ওঠে পাক বাহিনীর আক্রমণে। ক্ষিতীশ ও মেরিনার কন্যাসন্তান মূর্চ্ছনার জন্ম হয় বিকট বোমা বিস্ফোরণের শব্দকে সঙ্গে নিয়ে। পরিবারের অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত দেশচেতনা ধারণ করেই বেড়ে ওঠে সে। গির্জার ফাদার যোসেফ এবং স্থানীয় মিশনারি হাসপাতালটি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা ও আশ্রয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। হাসপাতালে নির্যাতিত নারী পারুলিয়া যুদ্ধশিশুর জন্ম দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়। ক্ষিতিশ ও মেরিনার উদ্যোগে শিশুটিকে গ্রামের নিঃসন্তান দম্পতি দত্তক গ্রহণ করে। যুদ্ধশিশুর প্রতি এই অসাধারণ দায়িত্বশীল উপলব্ধি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তীকালে বীরাঙ্গনা এবং যুদ্ধশিশুদের নানাবিধ করুণ পরিণতি বরণ করতে হতো না। হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী চন্দ্রমুখী আহত মুক্তিযোদ্ধার কেটে ফেলা পা সশ্রদ্ধচিত্তে বাগানের মাটিতে পুঁতে রাখে, যেন সেই পা থেকে জন্ম নেবে স্বাধীনতা নামের বৃক্ষ। সেখানে ফুল ফুটবে প্রতিদিন বাংলাদেশ নামে।

'কাঠকয়লার ছবি' সেলিনা হোসেনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দেখা যায় চৈতীরাণী নামে এক নির্যাতিত নারীকে, চৈতীরাণী আদিবাসী বাঙালি এবং চা-বাগানের শ্রমিক। একাত্তর সালে এইসব প্রান্তিক, অন্ত্যজ শ্রেণি যারা আজন্মকাল বহুবিধ শোষণের শিকার তারাও যুদ্ধে অবদান রেখেছিল নানাভাবে, ইতিহাসে যাদের কথা কোথাও লেখা নেই। যাদের আমরা অনেক সময় অকৃতজ্ঞের মতো বাঙালি বলে পরিচয় দিতেও লজ্জিত হই। চৈতীরাণী তেমন একটি চরিত্রের যে কিনা পাক বাহিনী এবং চা বাগানের বাঙালি ম্যানেজার কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয় এবং দুটো পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। যুদ্ধশিশু দুলালকে অবশ্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে বিদেশি দম্পতির কাছে দত্তক দিয়ে দেওয়া হয়।

'মাটি ও শস্যের বুনন' উপন্যাসের পারুলিয়াকে আমরা দেখেছি যুদ্ধশিশুকে ঘৃণার বশে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু এখানে দেখা যায় চৈতীরাণী নবজাতক শিশু হারানোর শোক আজীবন বহন করে চলে। এই উপন্যাসে একাধিক কাহিনির বিস্তারকে ছাপিয়ে যুদ্ধশিশু দুলালের উৎস সন্ধানের নিরন্তর প্রচেষ্টা উপন্যাসের মূল পটভূমি হয়ে পাঠক হৃদয়ে জেগে থাকে। দুলাল তার পালক পিতামাতার কাছে সব জানতে পেরে প্রথমে ভেঙে পড়লেও পরে জন্মদাত্রী মা এবং জন্মস্থান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। এই খুঁজে ফেরা প্রতিটি যুদ্ধশিশুর জীবনের বেদনাদীর্ণ প্রতিচ্ছবি। বীরাঙ্গনা ও তার যুদ্ধশিশু যুদ্ধের আগে পরে বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। শোকের প্রেক্ষাপটে জেগে থাকে ক্ষত নিরাময়ের অযোগ্য আঘাত ও অপমানের স্মৃতি। পুরো উপন্যাসে দুলালের শেকড় খুঁজে বেড়ানোর আর্তি ও হাহাকার মিলেমিশে যুদ্ধশিশুর বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবায়। নাড়ির টানেই যেন দুলাল খুঁজে পায় মাকে। চারপাশে ঢোলের আওয়াজে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। মৃত্যু সন্নিকট হলেও মাতা-পুত্র দুজনেরই বিসর্জনের বাদ্য যেন হয়ে ওঠে হোলি খেলার উৎসব। এভাবেই লেখক যেন বাংলাদেশের মানুষকে সচেতনভাবে যুদ্ধশিশু আর বীরাঙ্গনা মায়েদের বরণ করে নেওয়ার জন্য উৎসবের আহ্বান করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নারী নির্যাতন আর যুদ্ধশিশু একটি আদিম মারণাস্ত্র। সেই মারণাস্ত্রকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করতে হবে দেশবাসীকেই, মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

৩.

'যুদ্ধ', 'গেরিলা ও বীরাঙ্গনা' এবং 'দিনের রশিতে গিটঠু'– এই তিনটি উপন্যাসে লেখক সেলিনা হোসেন একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইতিহাসস্বীকৃত বীর নারীদের চরিত্র রূপায়ণ করেছেন। 'যুদ্ধ' উপন্যাসের শুরুই হয় তারামন বিবির স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে বাড়ি ফেরার দৃশ্যায়নে।

মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭২ সালে সরকার ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জনকে বীর উত্তম, ১৭৫ জনকে বীর বিক্রম এবং ৪২৬ জনকে বীরপ্রতীক খেতাব প্রদান করে। ৬৭৬ জন স্বীকৃত যোদ্ধার মধ্যে মাত্র দুজন হলেন নারী তাও বীর প্রতীক, এদেরই একজন তারামন। যিনি চরনেওয়াজী, কোদালকাঠী, তারাব, সাজাইসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অস্ত্রসহ যুদ্ধ করেছেন সফলতার সঙ্গে।

'দিনের রশিতে গিটঠু' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যুথিকা অপর সশস্ত্র যোদ্ধা বিথীকা বিশ্বাসের ছায়ায় নির্মিত। উপন্যাসের যুথিকা মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা নারীদের খুঁজে বের করে ঐক্যবদ্ধ করতে তৎপর হয়। সে বিশ্বাস করে, এই নারীরা বীরাঙ্গনা খেতাবের মাধ্যমে সমাজ দ্বারা ধিক্কার আর অবমাননার শিকার হয়েছে। একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা যে সম্মান পান সেই শ্রদ্ধা পান না অধিক নির্যাতন সহ্য করা নারী। রাষ্ট্রও এসব ইতিহাস আড়াল করতে তৎপর। যুথিকা তাই এই বীরাঙ্গনাদের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চায়।

সে দেখে, সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েও, যুদ্ধক্ষেত্রে নার্স হিসেবে সেবা প্রদান করেও কাঞ্চনমালা সমাজে ধিক্কৃত হয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে পরিবার থেকে পাক বাহিনীর ক্যাম্পে নির্যাতিত হওয়ার অপরাধ বিবেচনায়।

যুথিকা আরো দেখা করে সশস্ত্র যোদ্ধা কাঁকন বিবির সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি অনেক সময় বার্তাবাহকের কাজও করেছেন। এজন্য তিনি শরীরে মলমূত্র মেখে পাগল সেজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বার্তা সংগ্রহ করতে গিয়ে অগণিতবার নির্যাতনের শিকারও হয়েছেন। তিনিও বীরপ্রতীক খেতাবধারী যোদ্ধা।

কাঁকনবিবির মতোই অনুপ্রাণিত আরেকটি চরিত্র সোনামিথি। 'যুদ্ধ' উপন্যাসের সোনামিথি যেন স্বয়ং বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর মতো সে নিজেই শত্রুসেনার হাতে ধরা দেয় গ্রামকে বাঁচাতে। রাতের অন্ধকারে নৌকা চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধা পারাপার করে। স্বামী বাড়ুয়া মাঝি শহিদ হওয়ায় সে নির্যাতনের ফলে আসা সন্তানকে রেখে দিতে চায়। সে বলে– 'মানবশিশুর জন্মের দোষ থাকে না। ও হবে আমাদের যুদ্ধের সাক্ষী। কামারের দোকান থেকে দা বটি বানিয়ে আনে পাক সেনা হত্যা এবং নিজের নাড়ি কাটার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই একই মাতৃত্বকে বেণু অভিহিত করে 'জরায়ুর জখম' নামে। বেণুর প্রেমিক মাখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে পা হারিয়ে। বেণু মাখনকে বোঝায়, দেশের স্বাধীনতার জন্য সবাইকে কিছু না কিছু দান করতে হয়। মাখন যেমন পা দিয়েছে, বেণু দিয়েছে জরায়ুর ক্ষত। দুজনই সুস্থ হয়ে উঠে নতুন ঘর বাঁধবে স্বাধীন দেশের মাটিতে।'

প্রকৃতপক্ষে সোনামিথির মাতৃত্ব গ্রহণ আর বেণুর মাতৃত্ব বর্জন দুটোই সমার্থক ঘটনা। কিন্তু ভিন্ন অভিজ্ঞতায় নারীর বয়ানসমূহ আমাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ আলেখ্য তুলে ধরে ইতিহাসের স্বচ্ছতাকে জারি রাখে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারী ও পুরুষ যোদ্ধার স্বীকৃতির অনুপাত ১:৩২৮ হলেও অংশগ্রহণের অনুপাতটি এতটা ব্যবধানসূচক নয়, অনুমান করা যায়। অন্য অনেক কিছুর পাশাপাশি স্বীকৃত যোদ্ধা নারীর সংখ্যাগত এ দৈন্য পরবর্তী সময়ের ইতিহাসপ্রণেতাদের যোদ্ধা নারীদের অনুসন্ধান ও মূল্যায়নে প্রবৃত্ত না হওয়ার ব্যাপারে প্রভাবিত করে থাকবে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল সংগত কারণেই। দেখা গেছে, নারীর পরিবার, ধর্ম ও সমাজই সম্মিলিতভাবে নারীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করেছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং সমাজের রক্ষণশীল পরিবেশ ছাড়াও পরিবারগুলো সাধারণত ঘর-সংসার আগলে রাখার দায়িত্ব প্রদানের লক্ষ্যেই নারীর পরিবর্তে পুরুষ সদস্যদের যুদ্ধে পাঠানোর অনুমোদন দিয়ে থাকে।

নারীর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রথম যুদ্ধটি হয় নিজ পরিবার, সমাজ ও ধর্মীয় বিধিনিষিধের সঙ্গে। দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় যুদ্ধের প্রশাসকবর্গের সাথে। একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা নারীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানেও নারী-পুরুষের জেন্ডার বৈষম্য বিন্দুমাত্র নিরসন হয় নি। ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে উভয়কেই পেরিয়ে আসতে হয়েছে দুরূহ অভিজ্ঞতা, অথচ

দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে নারী শিকার হয়েছে অবিশ্বাস আর বৈষম্যের, তা-ও আবার প্রশাসনের তরফ থেকে। এই সব সামাজিক-পারিপার্শ্বিক ট্যাবু ভেঙে বেরিয়ে এসে নারী যখন সফল যুদ্ধাভিযান শেষে ঘরে ফিরেছে, তখন তার জন্য অপেক্ষা করেছে চতুর্থ যুদ্ধ; আর তা হলো স্বীকৃতিপ্রাপ্তির যুদ্ধ। স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘকাল আমরা জানতেই পারি নি মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর সশস্ত্র অংশগ্রহণের কথা। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ অংশগ্রহণের চিত্রগুলোও ইতিহাস, গল্প-উপন্যাস বা নাটক-সিনেমায় প্রতিফলিত হয় নি।

নারীর নির্যাতিত অসহায় রূপটি ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা বা অবদানের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া বা প্রচ্ছন্ন করে দেওয়াটা চরম পুরুষবাদী মনোভাবের লক্ষণ। এমনকি নারীর নির্যাতিত রূপটিকেও সম্মানিতভাবে কোথাও উপস্থাপন করা হয় নি। তাদের নিয়তির হাতে বন্দি পুতুলের মতো নির্বাসিত, মৃতপ্রায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার অন্ধকারে বিলীন হতে দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে লেখক সেলিনা হোসেনের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

'বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীকে মূলধারায় স্থাপন না করার ফলে নারীর প্রকৃত ইতিহাস যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি। নারী মুক্তিযুদ্ধে যে গৌরবগাথা রচনা করেছিল, তা ধর্ষিত এবং নির্যাতিত নারীর ভূমিকায় অদৃশ্য হয়ে আছে। প্রকৃত অবদান খুঁজে নারীকে মূলধারায় না আনার আরও একটি কারণ, নিম্নবর্গের নারীরাই ব্যাপকভাবে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। নিম্নবর্গের নারীর ইতিহাস ক্ষমতাসীন সুশীল সমাজের কাছে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গৃহীত হতে শুরু করে স্বাধীনতার তিন দশক পরে। ...সাধারণ শিক্ষিতজন এবং নিরক্ষর অধিকাংশ মানুষের প্রচলিত ধারণায় মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে নি। নারী যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন গুটিকয়েক নারী। যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে নারী ধর্ষণের ঘটনা প্রচার লাভ করেছে অনেক বেশি। যে কারণে নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিতজনেরা অবলীলায় বলে যান, তিরিশ লাখ শহীদ এবং দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা...। ধর্ষণ, নারী নিপীড়নের ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা। যুদ্ধের সময় নারী-ধর্ষণ শত্রুপক্ষের যুদ্ধকৌশল। এর লড়াকু প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে, নৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এখানে ইজ্জতের প্রশ্ন ওঠে না। যুদ্ধে নারীর মর্যাদা সমানভাবে যোদ্ধার।'

অর্থাৎ যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটেও নারীর ভূমিকা পরোক্ষ বা অস্পষ্ট। কখনো বিতর্কিত অথবা অবস্থানগতভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়ে গেছে। সেটা বাস্তবেই হোক কিংবা শিল্প-সাহিত্যের নির্মাণে। দ্বিতীয়ত, নারীর ক্ষমতায়নের বিবিধ শর্ত, যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল প্রকার কার্যপ্রণালি বা ঘটনাপ্রবাহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ক্ষমতা অর্জন এবং সকল পর্যায়ে সমঅধিকার নিশ্চিকরণের বিষয়গুলো একাত্তর-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর জন্য ন্যূনতম পর্যায়েও নিশ্চিত করা যায় নি।

সশস্ত্র অংশগ্রহণসহ বহুমুখী ইতিহাসকে ধীরে ধীর পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসতে শুরু করলেও জনমনে সৃষ্টি হওয়া ইমেজ বা প্রতিচ্ছবিকে সঠিকরূপে রূপায়িত করতে হলে এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিফলন দিতে হলে অবশ্যই এ দেশের শিল্প-সাহিত্যে সেই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। কেননা, মানুষের মনে ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী। সেলিনা হোসেন তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে নারীর এইসব ভিতর-বাহিরের যুদ্ধের বিষয়টিকে মাথায় রেখে আবেগ ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কেবল দুটি দেশের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ছিল না। ছিল না কোনো দেশ দখলের অপপ্রয়াস। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নির্মিত সাংস্কৃতিক চেতনা ও সম্মিলিত প্রতিরোধ একাত্তরে এসে জনযুদ্ধে রূপ নেয়। যুদ্ধের সময় নারী জনগণের অর্ধাংশ হিসেবেই সমাজে, পরিবারে, শরণার্থী শিবিরে, যুদ্ধক্ষেত্রে, বাংকারে, বন্দি শিবিরে উপস্থিত ছিল। একদিকে যোগ্যতার বিবেচনা অনুসারেই সে সশস্ত্র যুদ্ধে বা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সব কাজে পৌরুষোচিত কঠোরতায় অংশ নিয়েছে, আবার স্নেহপরবশে যুদ্ধের নেপথ্যে যোদ্ধাদের টিকে থাকার শক্তি, বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়ে গেছে। অপর দিকে সর্বদা তার সঙ্গী ছিল ধর্ষিত-নির্যাতিত হওয়ার ভয়, যা কোনো পুরুষের পক্ষে অনুভব করাও কঠিন।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রেও চিন্তার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রে নারীর নির্যাতিত হওয়ার ঘটনাসমূহ উল্লেখ করে তাদের আত্মত্যাগকে জনগণের সমবেদনা ও করুণালাভের প্রয়াসে বিশেষভাবে যতখানি চিহ্নিত করা হয়েছে, মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের দিকটি ততখানিই অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। যেমন বীর ছাত্রী রওশন আরা বুকে মাইন বেঁধে আত্মাহুতি দিয়ে ট্যাংক বিধ্বস্তকরণে সফল হলেও মুক্তিযুদ্ধের দলিলাদিতে শহিদের তালিকায় তাঁর নাম ওঠে নি। স্থান পায় নি ভাগীরথীর মতো সাহসী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার নামও। আবার অনেক নারী যুদ্ধরত অবস্থায় যখন পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে নির্যাতনের শিকার হন, তখন তাঁর 'মুক্তিযোদ্ধা' নয়, বরং ধর্ষিত পরিচয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে।

১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে প্রথমবারের মতো স্বাধীনতাযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অসামান্য অবদানের কথা স্বীকৃত হয়।

সশস্ত্র যোদ্ধা যে নারীও হতে পারেন, এ সত্যটি ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, সদরপুরের জমিদার পিয়ারী সুন্দরী, সশস্ত্র বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তেজিয়ান সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা, টঙ্ক বিদ্রোহী বীরকন্যা রাসমণি হাজংয়ের উদাহরণ সামনে থাকতেও পুরুষপ্রধান বাঙালি সমাজ দীর্ঘকাল মুক্তিযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয়টি মেনে নিতে পারে নি। তারামন বিবি বীর প্রতীক অথবা বাগেরহাটের সশস্ত্র যোদ্ধা হালিমারা যুদ্ধক্ষেত্রেও পরিবার ও সমাজের মতো জেন্ডার

বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সহযোদ্ধা হিসেবে নয়, বরং প্রথমে তাদের নারী হিসেবে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে ক্যাম্পের রান্নাবান্নার দায়িত্ব গ্রহণ করে সবার বিশ্বাস আর মনোতুষ্টি অর্জন করতে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সেলিনা হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নারীর জীবন অধ্যয়নের একটি বড়ো দিক। এই যুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতার মতো একটি বড়ো অর্জনে। এতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তার জীবন বাজি রাখার ঘটনা। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীকে মূলধারায় স্থাপন না করার ফলে নারীর প্রকৃত ইতিহাস যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় নি। নারী এই মুক্তিযুদ্ধে যে গৌরবগাথা রচনা করেছিল, তা ধর্ষিত ও নির্যাতিত নারীর ভূমিকায় অদৃশ্য হয়ে আছে। অন্যদিকে নারীর যে নিজস্ব মুক্তির জায়গাটি, অর্থাৎ একজন মানুষ হিসেবে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বিষয়টিও দারুণভাবে কেবল উপেক্ষিত নয়, রীতিমতো অপমানিত হয়েছে।'

আজ বিভিন্ন তথ্যসূত্রে প্রমাণ মিলছে, মুক্তিযুদ্ধে বহু নারী রণাঙ্গনে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন। অনেকেই সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য ও গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। রংপুরের তারামন বিবি (বীর প্রতীক) সিলেটের কাঁকন বিবি, পাবনার শিরিন বানু মিতিল, যশোরের বাঘারপাড়ার হালিমা পারভীন ও রওশন আরা, যশোরের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন সংগঠন নিউক্লিয়াসের সদস্য মমতাজ বেগম ও সাহিদা বেগম, বরিশালের নারিকেলবাড়িয়ার রোকেয়া খাতুন, শাহানারা পারভীন শোভা, আলমতাজ বেগম ছবি, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, রত্না ও ফাতেমা বেগম, চুয়াডাঙ্গার ১২ বছরের কিশোরী আলেয়া বেগম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতালাভের চার দশক পেরিয়ে গেলেও সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তিগত– কোনো পর্যায়েই মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিলপত্রে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণীত হয় নি।

এ ছাড়া ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, শহিদ ভাগীরথী, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, ফোরকান বেগম, নমিতা ঘোষ, স্বাধীন বাংলা বেতারের নিয়মিত কর্মী বেগম মুশতারী শফি, শাহীন সামাদ প্রমুখ নারী রণাঙ্গনে অস্ত্রের জোগান, মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন তথ্য সরবরাহ, যুদ্ধে প্রণোদনা প্রদান ও সংগঠিতকরণ, চিকিৎসাসেবা, অন্ন-বস্ত্রের জোগান, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম স্বামী-সন্তান-ভাইকে যুদ্ধে পাঠিয়ে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ, দেশাত্মবোধক গান-কবিতা আবৃত্তি পরিবেশনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেন। এ ছাড়া যুদ্ধরতদের আহার-পরিধেয়, যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রাদি তৈরির মালমসলা ক্রয় এবং শরণার্থীদের জীবন ধারণের জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। এই অর্থ সংগ্রহের একটি অন্যতম উৎস ছিল সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ।

সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাতটি উপন্যাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমুখী ভূমিকার রূপায়ণ দেখা গেছে। উপন্যাসগুলোতে সশস্ত্রযোদ্ধা নারী, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সন্তান-স্বজন উৎসর্গকারী, নির্যাতিত বীরাঙ্গনা, খাদ্য ও আশ্রয়দাত্রী, চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী এবং কখনোবা অজ্ঞাতনামা মুক্তিযোদ্ধার লাশের দাফনকারী হিসেবে নারীদের জানাজা দিতেও দেখা গেছে। উল্লিখিত নারীদের কারো প্রেক্ষাপট রাজধানী ঢাকা, কেউ মফস্বলে বেড়ে ওঠা আবার কেউ প্রত্যন্ত অজপাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা। বয়স কৈশোর পেরোনো থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত। কেউ শিক্ষিত কেউবা নিরক্ষর। কিন্তু চেতনায় তাঁরা একই সমতলে, স্বাধীনতার মন্ত্রে একইভাবে উজ্জীবিত। উপমহাদেশে নারী আন্দোলনের দীর্ঘ সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার কারণ হলো, পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণকে সুকৌশলে আড়াল করে তার অবস্থানকে সর্বদা করুণার যোগ্য করে প্রদর্শন করা হয়। যেমনটি আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষিজীবী শ্রেণির ক্ষেত্রে দেখা যায়। অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায়ই যেখানে চরম বৈষম্যের শিকার, সেখানে ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রায় অর্ধেক দায়িত্ব পালন করেও নারী যোগ্য মজুরি কিংবা স্বীকৃতি পাবে না, এটা তো খুবই স্বাভাবিক বিষয়। সেলিনা হোসেন তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ও আন্দোলন-সংগ্রামভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে সেই জেন্ডারভিত্তিক অসমতার কথা তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দৃঢ় এবং স্পষ্টভাবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া কবীর জানান, 'মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে সারা পূর্ববঙ্গে ১৪ লাখ বাঙালি নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও স্বজনহারা নিঃস্বে পরিণত হয়েছে। এই ১৪ লাখের মধ্যে ৪ লাখ (মতান্তরে ২ লাখ ৫০ হাজার, ড. জিওফ্রে ডেভিসের মতে এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে) নারী বর্বর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং বিহারি কর্তৃক বলাৎকার-ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।' এই বিপুল সংখ্যা এটা প্রমাণ করে যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একাত্তরের স্বাধীনতা আনয়নে বাঙালি নারীকে চরম বীভৎসতার শিকার হতে হয়েছে। অথচ কোনো সৌধ বা মিনারেই এই নির্যাতিতদের নাম খোদাই করে রাখা হয় নি। এমনকি প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র কিংবা ইতিহাসে অথবা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র সর্বত্রই অসম্পূর্ণ, অপূর্ণ।

ধর্ষণ একজন নারীর জীবনে এমন একটি অভিজ্ঞতা, যা পৃথিবীর কোনো দুঃখ-কষ্টের সঙ্গেই তুলনীয় নয়। গণধর্ষণ তো প্রশ্নাতীত বিষয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রশ্নে হত্যা আর ধর্ষণ সমার্থক। কারণ, ধর্ষণ কেবল শারীরিক আঘাতেই শেষ হয় না, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় ধর্ষিত নারীটির চরম অবমাননাকর অভিজ্ঞতা, যা পরবর্তী সময়ে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা দেয়। সঙ্গে যদি সামাজিক-পারিবারিক লাঞ্ছনা যুক্ত হয়, তবে ওই নারীটি মৌলিক চাহিদাসম্পন্ন মানুষের চেয়ে অনেক নিচে নেমে যায়। আত্মহত্যা বা গর্ভপাতজনিত কারণে যদি তার মৃত্যু না ঘটে থাকে, তবে সে সমাজে করুণা আর লজ্জায় মানবেতর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে।

'যুদ্ধ' উপন্যাসে বিধৃত সুনন্দার সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, সোনামিথির যুদ্ধশিশুকে বরণ আর বেণুর মাতৃত্ব বর্জন– তিনটি ঘটনা নারীভাষ্যে বয়ান করে একাত্তরের যুদ্ধকালীন নারীজীবনের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান, যা পাঠকের সামনে তুলে ধরে বীরাঙ্গনা নারীদের বীরগাথার অভিন্ন আলেখ্য।

এই উপন্যাসে ছহিতনের চরিত্রটি তারামনের মতোই ঐতিহাসিক চরিত্রের আলোয় নির্মিত। 'কসবার কুল্লাপাথর এলাকায় ৫১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধি রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা আবদুল করিমের মা মহীয়সী নারী আরজাতুন নেসা তাঁর স্বামী আবদুল মান্নানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস এই এলাকার আশপাশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেসব লাশ গোসল করিয়ে বীরের মর্যাদায় দাফন করার দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল এবং লাশ ধোয়ানোর চৌকিটি এই স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। স্বাধীনতার পর শহিদের স্বজনেরা লাশের খোঁজে আসতেন। আহাজারিতে ভরিয়ে তুলতেন তাদের বাড়ির চারপাশ। সেই শোকে-দুঃখে আরজাতুন নেসা বেশি দিন বাঁচেন নি। ১৯৭৩ সালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।'

এই অসাধারণ চরিত্রের আলোকে সৃষ্ট ছহিতনকে আমরা দেখতে পাই যুদ্ধের সময় সেবাপরায়ণতার অনন্য দৃষ্টান্তরূপে। উপন্যাসে যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, মকবুল-ছহিতনের দুই ছেলে রজব ও তরফ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। রজবদের সহযোদ্ধা হাবিব যুদ্ধে শহিদ হয়। তাদের বাবা-মাকে চিঠি লিখে শহিদের লাশ দাফন করার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানায়। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বৃদ্ধ মকবুল ও ছহিতন পড়ে থাকা সেই লাশ সুপারিপাতায় করে টেনে নিয়ে এসে নিজেরাই কবর খুঁড়ে দাফন করে। বৃদ্ধ ছহিতন বরইপাতা দিয়ে পানি গরম করে লাশ গোসল করানোর জন্য। কাফনের কাপড় না থাকায় মাঝরাতেই লাশের পরনের কাপড় ধুয়ে দেয় পুকুরের পানিতে। ধর্মের নিয়ম ভেঙে বৃদ্ধ ছহিতনও জানাজায় দাঁড়ায়। কারণ, 'যুদ্ধের সময় মাইয়া লোক, বেডা লোক নাই। যুদ্ধের সময় যুদ্ধই তো ধর্ম।'

'দিনের রশিতে গিট্ঠু' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যুথিকা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র যোদ্ধা বীথিকা বিশ্বাসের ছায়ায় নির্মিত। বীথিকার মানসগঠন, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মপরিকল্পনা, প্রথাবদ্ধ বাঙালি মেয়ের মতো ছিল না। রাজনীতিসচেতনভাবে বেড়ে ওঠা বীথিকা অসমসাহসিকতায় মুক্তিযুদ্ধের একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপন্যাসে যুথিকার মানসগঠনের পেছনে লেখক সচেতনভাবে একটি প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন। যুথিকার বড়ো বোনকে যুথিকার বাবা বাল্যবিয়ে দিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সে বাবার বাড়ি যেদিন পালিয়ে আসে, ওই দিনই যুথিকার জন্ম হয়। যুথিকার বড়ো বোন মাকে আরো একটি কন্যাসন্তান জন্মদানের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করে এবং আত্মহত্যা করে। জন্মক্ষণের এই দুঃসহ ইতিহাসকে সঙ্গে নিয়ে যুথিকা বড়ো হয়। অসংখ্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যার জন্ম, গ্লানির পরিবর্তে ক্ষোভ আর প্রতিবাদ তাকে পরিস্থিতির পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ করে। দুরন্ত যুথিকা ঋতুমতী হয়েও ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করে, মায়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুলেও যায়।

এমন একটি বেদনাবিক্ষুব্ধ, হাসি-কান্নায় মিশ্রিত, স্নেহে-আদরে বিজড়িত শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে যৌবনের পদপ্রান্তে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু সারা বিশ্বের নির্যাতিত-অবদমিত নারী। প্রাসঙ্গিকভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রসঙ্গ গুরুত্বসহকারে উত্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্যে যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল, তা প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্র-কাহিনির সন্নিবেশে।

জন্মাবধি পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড়ো হওয়া যুথিকা যুদ্ধে যেতে বদ্ধপরিকর হয়। বাধা আসে পরিবার-সমাজের কাছ থেকে। বাধা আসে খোদ যুদ্ধের প্রশাসকবর্গের কাছ থেকে। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুথিকা সব বাধা অতিক্রম করে দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জকে জীবনের সঙ্গী করে নেয়। যেসব অপারেশনে পুরুষও যেতে পিছপা হয়, সেসব ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সে তার প্রেমিক জামিরুলকে হারায়। নৌপথে শত্রুশিবিরে জীবনবাজি রেখে গ্রেনেড বিস্ফোরণের মিশনে ডাক পড়লে জামিরুলের মতো অনেক পুরুষই যেখানে যেতে সাহস পায় না, সেখানে এগিয়ে যায় যুথিকা আর শিশিরকণা (রত্না)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি পরিবারেও নারীর এগিয়ে থাকাকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। জামিরুলকে হারিয়ে যুথিকার জীবনে আরেক যুদ্ধ শুরু হয়। একাকিত্ব কেবল প্রেমিক হারানোর শূন্যতায় নয়। এই বেদনাহত অতীতের সঙ্গে যুক্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অস্বীকারের রাজনীতি। দেশে বারবার স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। দেশটাকে তখন যুথিকার ডাস্টবিনের মতো অনুভূত হতে থাকে।

প্রবল আত্মশক্তির জোরে সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে পারলেও যুথিকা দেখতে পায়, স্বাধীনতার স্বপ্নগুলো অপূর্ণই রয়ে গেছে। দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী নারীগণ 'বীরাঙ্গনা' শিরোনামযুক্ত খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হচ্ছে। সম্মানিত হওয়া তো দূরে, সমাজ-রাষ্ট্র-পরিবার কোথাও তাদের স্থান হয় নি। এমনকি সশস্ত্রযুদ্ধে অংশ নিয়েও, যুদ্ধক্ষেত্রে নার্স হিসেবে সেবা প্রদান করেও কাঞ্চনমালা সমাজে ধিকৃত হয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে পরিবার থেকে ধর্ষিতা হওয়ার অপরাধ বিবেচনায়।

যুথিকা সশস্ত্রযোদ্ধা হিসেবে সর্বত্র সম্মান পেয়েও তাই নিজেকে ব্যর্থ ও একা মনে করে। কিন্তু হতাশাগ্রস্ত হলেও যুথিকা থেমে যায় নি। একাত্তরে যেমন যোদ্ধানারীর অধিকারকে সসম্মানে জয় করেছিল, তেমনিভাবে স্বাধীন দেশের মাটিতে বীরাঙ্গনাদের হারিয়ে যাওয়া সম্মানকে ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয় যুথিকা। পরিবার থেকে যারা বিচ্যুত, তাদের পরিবারে প্রতিষ্ঠা প্রদান করা, সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া– এমনই ছোটো ছোটো উদ্যোগের মাধ্যমে এক বৃহৎ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয় সে। যুথিকার এই উদ্যোগ, বীরাঙ্গনাদের খুঁজে ফেরার মধ্য দিয়ে আমরা প্রবেশ করি অনিঃশেষ এক বেদনার জগতে। অধিকাংশ হারিয়ে যাওয়া

বীর নারীর ভেতর কয়েকজন বীরাঙ্গনা নারীর মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধের সুবিশাল প্রাপ্তির পাশাপাশি অবিরল এক রক্তপাতের খবর, যা প্রকাশ্য অথচ গোপন। যাকে সমাজ-রাষ্ট্র, পুস্তকে-সভায়-বক্তৃতায় ত্যাগের স্বীকৃতি দেয় কিন্তু স্বয়ং ব্যক্তিটিকে সশরীরে কোথাও উপস্থাপন করতে, কিংবা পরিচিতি দিতে কুণ্ঠিত হয়, বিব্রত বোধ করে।

উপন্যাসে উপস্থাপিত কাঁকন বিবির চরিত্রটি ইতিহাসের সত্য থেকে তুলে আনা। খাসিয়া কন্যা কাঁকন বিবি একাধারে নির্যাতিতা বীরাঙ্গনা, পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, অস্ত্র ও বার্তাবাহকরূপে নিযুক্ত। কাঁকন বিবি বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত বীর প্রতীক খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও শেষদিন পর্যন্ত কাঁকন বিবিকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছিল।

কাঁকন বিবি তবু ভাগ্যবান যে অন্ন-বস্ত্রের অভাব হলেও মানুষ তাঁকে সম্মান জানায় এখনো। তাঁকে 'মুক্তিবেটি' নামে ডাকে। তাই 'দৃষ্টির যুদ্ধকালীন তীব্রতা তার চোখে অমলিন। সেই ছবি যুথিকাকে আরো সাহসী করে তোলে। যুথিকার মনে হয় বীর নারীদের এক করার যে কাজে ও নেমেছে সেখানে কাঁকন বিবিদের সাহস ওকে শক্তি জোগাবে।'

কিন্তু এই মনোভাব অটুট রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে আদুরজানের মুখোমুখি দাঁড়ানোর পর। আদুরজান বাংলাদেশের সেই সব হারিয়ে যাওয়া নামের প্রতিনিধি, যারা স্বাধীন দেশের মাটিতে চিরতরে নির্বাসিত। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম-বীভৎস নির্যাতনকে প্রত্যক্ষ করার পর আদুরজানেরা বাড়ি ফিরতে চেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে ভর দিয়ে অত্যাচারে বিদীর্ণ শরীরে ফুলেফেঁপে ওঠা গর্ভ নিয়ে আদুরজান বাড়ি ফিরেও ছিল। 'এক ধরনের ঘোর ছিল বাড়ি ফেরার মধ্যে। স্বাধীনতার মতো বড়ো অর্জনের পর অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোরে বাড়ি ফেরা– অন্যরকম ফেরা। একজীবনে এমন করে বাড়ি ফেরা সবার জীবনে ঘটে না। ...ভেবেছিল ওর অপেক্ষায় আছে বাবা, অপেক্ষায় আছে মা এবং যুদ্ধ করতে না-যাওয়া ভাইয়েরা। ভেবেছিল, ওর বাড়ির ওপর নেমে আসবে আকাশ, ফুলের গন্ধে ভরে থাকবে বাড়ি।' কিন্তু সৃষ্টি হয় বিপরীত ইতিহাস। 'ও সবার মুখের দিকে তাকায়। প্রথমে বাবার ভাবলেশহীন নিষ্ঠুর-নির্দয় চেহারা। দ্বিতীয় মা যেন এমন মেয়ে পেটে ধরে জন্মের দায় ভোলার যন্ত্রণায় অস্থির। তৃতীয় তিন ভাই জল্লাদের মতো খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে গর্দান ছিন্ন করার অপেক্ষায়। বাকি আছে পরিবারের আরো কাছের-দূরের একগাদা আত্মীয়স্বজন। ...আছে পাড়া-প্রতিবেশী, যারা সমাজের মানুষ– তাদের উঁচিয়ে রাখা তর্জনী অনবরত শাসাচ্ছে। যেন ওর চেহারা আমাদের দেখতে না হয়। পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পটা ছিল আকারে ছোটো। এই ক্যাম্প বিশাল– দেশজুড়ে। শতশত নারী এই ক্যাম্পের নিষ্পেষণে গোঙাচ্ছে।'

আদুরজানের গর্ভস্থ সন্তানকে তার অজান্তেই জন্মের পর কোথাও পুঁতে ফেলা হয়। আদুরজানদের জন্য অবশিষ্ট থাকে নারকীয় অতীতের স্মৃতি, যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবমাননাকর বর্তমান আর কুয়াশাচ্ছন্ন

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কাঁকন বিবি তবু গর্ব করতে পারে অতীত নিয়ে। বার্তাবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁকে অনেক সময়ই সমঝোতা করতে হয়েছে। ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, চরিত্রগত সংস্কারকে দূরে ঠেলে দিতে হয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তবু কাঁকন বিবি আজও দণ্ডায়মান পতাকার মতো মাথা উঁচু করে বাঁচে। দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে অবস্থান করলেও মর্যাদাবোধ এতটুকু কমে নি। সে বলে– 'যুদ্ধের সময় আমার মতো দাপটে কেউ ঘুরে বেড়ায়নি রে। আমার কোনো ভয় ছিল না। আমার শরীরটা ছিল আমার দেশ। ওটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম দেশকে। যেখানে চিত করে শুইয়ে দিয়েছিল, আমি শুয়েছিলাম। খানসেনা আর রাজাকার যে-ই হোক না কেন কিছু আসে যায় না। আর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অপারেশনে যেতে আমার ভয় ছিল না– গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়ার সময় আমি জোরে জোরে গান গাইতাম। আমার গান শুনে মুক্তিযোদ্ধারা বুঝে যেত যে আমি ওদের ক্যাম্পে যাচ্ছি পাকিস্তানি সেনাদের খবরাখবর নিয়ে।'

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আদুরজানের আর্ত-হাহাকার অথবা কাঁকন বিবির স্বাধীনতার অন্তহীন অকৃত্রিম চেতনা ধারণ– কোনোটিরই কোনো মূল্যায়ন স্বদেশবাসী করে নি।

কাঞ্চনমালার কাহিনিতেও নতুনত্ব কিছু নেই, বরং আরো বেশি করে যুক্ত হয়েছে নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতা আর অবিরল পুরুষতান্ত্রিক নিষ্পেষণের ইতিহাস।

কাঞ্চনমালার চরিত্রটিও ইতিহাসের অংশ। কাঞ্চনমালা এমন এক নারীর উদাহরণ, যিনি মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের পাশবিকতার শিকার হয়েছেন এবং সশস্ত্র যোদ্ধা ও সেবিকার ভূমিকা পালন করেছেন।

আদুরজানের তুলনায় কাঞ্চনমালার সৌভাগ্য যে তাকে তার শ্বশুরপক্ষ সসম্মানে গ্রহণ করেছিল। আর তার স্বামীকেও বাধ্য করেছিল স্ত্রীকে মেনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের ধর্মীয়-সামাজিক সংবিধানে অলিখিতভাবে নারীর কর্তা-বিধাতারূপে স্বামীই বিরাজমান। তাই তার গ্রহণ করা, না করার ওপরই এখনো ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে নারীর ভাগ্য নির্ভরশীল। একান্ত ক্ষোভের সঙ্গে কাঞ্চনমালা তার মর্মযাতনার কথা প্রকাশ করে জানায় যে পরিবারের চাপের মুখে ধর্ষিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করতে বাধ্য করায় দিনে-রাতে স্বামীর কাছে নির্যাতন-অপমান আর লাঞ্ছনার কোনো পরিসীমা ছিল না। কিন্তু নারী জীবনে বেদনার অধ্যায় অপূর্ণ থেকে যায় যৌন নিপীড়ন ছাড়া। আদুরজান মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে নিজে কয়েদির মতো নাটকীয় শ্বাসরুদ্ধকর জীবন কাটিয়েছে, তবু প্রতিবাদী হয়ে জোর করে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে নি। কারণ, বাড়ির বাইরে নারীর অন্যরকম বিপদ ওঁত পেতে থাকে। তাই সে যুথিকার প্রশ্নের জবাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, 'যেতাম কোথায়? রাস্তায়? আবার তো শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেত। কতবার, কতবার জানোয়ারের খাদ্য হব।'

যে ভয়ে আদুরজানেরা গৃহনিপীড়ন সহ্য করে সেই ঘরেই পাশবিকতার অধ্যায় শুরু করে স্বয়ং কাঞ্চনমালার স্বামী, নারীর কথিত কর্তা-বিধাতা। পিতৃগৃহ থেকে পূর্বেই ফেরত পাঠানো

কাঞ্চনমালা তবু সহ্য করেই ছিল। কিন্তু স্বামীর পুনরায় বিবাহে সে ঘর ছাড়ে। এরকম সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী নারীদের যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাস কোনো ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। কাঁকন বিবির মতো করে বলতে গেলে বলা যায়–

'আমার শরীরটাই বাংলাদেশ। ন্যাংটো হয়ে তোকে দেখাতে পারলে দেখতি শরীরটায় নির্যাতনের খানাখন্দ। এই শরীরটা দেখলেই মুক্তিযুদ্ধ দেখা হয়।'

যদি ভাবা হয়, নির্যাতিত হওয়াটাকে এই নারী নিয়তি বা ভাগ্যলিখন হিসেবে মেনে নিয়ে যুদ্ধের সময়টাকেই দায়ী করেছে অথবা পরবর্তীকালের অবমাননাকর পরিণতির জন্য স্বাধীনতার চেতনাকে হারিয়ে ফেলেছে, তাহলে চোখ ফেরাতে হবে কাঁকন বিবির দিকে। যে কিনা নিজেকে 'মুক্তিবেটি' বলে সম্বোধিত হওয়াটাকে জীবনের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার বলে ভাবে। শুনতে হবে কাঞ্চনমালার স্বপ্নের কথা, যুথিকার আন্দোলনের কথা শুনে যে বলে, 'আপনারা মিছিল করলে আমাকে একশো একটা পতাকা দেবেন। আমি একশো একটা পতাকা নিয়ে মিছিল করব। এ দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন কারো চাইতে আমার কম ছিল না।'

সশস্ত্র যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতায় মানুষ হয়ে ওঠা যুথিকা তার নারী অভিজ্ঞতার ইতি-নেতিবাচকতাকে ধরে রাখতে চায় উপন্যাস রচনায়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত-অবহেলিত নারীদের নিয়ে ভিন্নধারার আন্দোলনও গড়ে তুলতে চায়। যুথিকা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দেয়। উদ্দেশ্য একটাই– নারীবান্ধব পৃথিবী গড়ে তোলা। সাধারণ মানুষমাত্রই সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন অব্যবস্থা এবং অপব্যবস্থার শিকার। কিন্তু নারীর শোষণের মাত্রা সর্বত্র এবং সর্বকালব্যাপীই পুরুষের তুলনায় পরিমাণে দ্বিগুণ অথবা বেশি। নারীকে প্রথমত শোষণ করে রাষ্ট্রযন্ত্র, দ্বিতীয়ত পুরুষ। তাই আজও কন্যাশিশুর জন্মে অসন্তুষ্ট জনক-জননী তাকে পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলে দেয় ডাস্টবিনে। উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায়, যুথিকা তার দালানের কার্নিশে পড়ে থাকা সদ্যোজাত এক কন্যাশিশুকে দত্তক নেয়। বড়ো বোনের নামে নাম রাখে লতিফা। বড়ো বোন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে পুরুষতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছিল। কিন্তু আজকের লতিফা সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত। আদুরজান যেভাবে কাক তাড়ানোর লাঠিটা যুথিকার হাতে তুলে দিয়েছিল সমাজের কাক তাড়ানোর প্রতীকী উদ্দেশ্যে, সেভাবেই যুথিকাও নারীবান্ধব পৃথিবী গড়ে তোলার আন্দোলনে পরিত্যক্ত এক নারী শিশুর হাতে আন্দোলনের নেতৃত্ব তুলে দেয়।

'গেরিলা ও বীরাঙ্গনা' উপন্যাসের নামকরণের মধ্য দিয়েও লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি গেরিলা ভূমিকায়নেরই আরেকটি সমার্থক শব্দ। উপন্যাসে মেরিনা-মাহমুদা দুজনই সরাসরি শহিদ গেরিলাযোদ্ধা।

এই উপন্যাসে রাবেয়া নামে একটি চরিত্র আছে, এটিও পুরোপুরি ইতিহাসনির্ভর বাস্তব চরিত্র। রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের এই পরিচ্ছন্নতাকর্মীর বয়ান থেকেই ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের

উন্মোচন ঘটে। পুরুষতন্ত্র ধর্মের নামে নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচারকে জায়েজ করে নেয়। যুদ্ধকালে বিপক্ষ দলের বন্দি নারী, বিশেষত বিধর্মী নারীগণ নাকি গনিমতের মাল হিসেবে বিবেচিত হবে এইসব ফতোয়া প্রকারান্তরে ধর্ষণ ও পতিতাবৃত্তিকে পরোক্ষভাবে সনদ দান করে। নারীর প্রতি চরম অবমাননামূলক এসব তত্ত্ব-তথ্য প্রচার করে সেই সময়কার দেশবিরোধী, সাম্প্রদায়িক রাজাকার বাহিনী পুরুষতন্ত্রের নিষ্ঠুরতম নৃশংস নির্যাতন চালায় ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে নিজ দেশের নারীদের ওপর।

কিন্তু স্বাধীন দেশে সেসব নারীর ক্ষতবিক্ষত জীবন নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নতুনতর নির্যাতনের অধ্যায় গ্রথিত করেছে, যার প্রয়োগ ভিন্নরূপ হলেও নিষ্ঠুরতার দিক থেকে কোনো পৃথকত্ব দেখা যায় না।

৪.

এভাবেই কারো দানে পাওয়া নয়, বরং বহুমূল্যে কেনা স্বাধীন বাংলায় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পান না, দুই লক্ষাধিক নির্যাতিত নারী মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া তো দূর, বরং চরিত্রহীন ফতোয়া দিয়ে আজও তাদের গ্রামছাড়া করা হয়। সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির অংশগ্রহণে সংঘটিত জনযুদ্ধে পাওয়া স্বাধীন দেশে প্রতি বছর দুর্গাপূজায় মূর্তি ভাঙা হয়, দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকের সামাজিক সম্মান আজ নেই বললেই চলে।

সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো এসব দায়বদ্ধতা থেকেই রচিত। ইতিহাসের সত্য যেখানে আড়াল করার চেষ্টা চলে, তিনি সেখানে আলো ফেলেন বেশি করে, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সকল প্রকার শোষিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন, সাহিত্যের মাধ্যমে।

তবু, 'বিশুদ্ধবাদী' শিল্প সমালোচকবৃন্দ সেলিনা হোসেনের লেখার এই উদ্দেশ্যপ্রবণতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ভালো-মন্দকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিতকরণের প্রতিক্রিয়াকে তীব্রভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।

প্রশ্ন ওঠে, অতিরিক্ত ইতিহাসনির্ভরতা, তথ্য বাহুল্য কি সাহিত্যর শৈল্পিক দিককে ক্ষুণ্ন করে?

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে শিল্প জীবনের জন্য নাকি শুধুই শিল্পের জন্য এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে বটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কের অবসান ঘটে নি, কারণ দুটোর পক্ষেই জোরালো যুক্তি রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের পর বোদলেয়ারের মতো কবিও 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বকে অস্বীকার করে 'লা স্যালুট পাবলিক' নামে এক সাময়িকী প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, যেখানে তিনি ঘোষণা দেন শিল্পের সামাজিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' প্রবলভাবে প্রচারধর্মী উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য হয়েও বিশ্বব্যাপী তার গ্রহণযোগ্যতা শিল্পরূপেই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস ফর্মের দিক থেকে পাশ্চাত্যরীতির অনুসারী হলেও প্রেক্ষাপট সর্বদাই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম। সুলতানের ছবি এদেশের সমৃদ্ধ

কৃষকের আনন্দিত জীবনের কথা বলে। সময়ের প্রয়োজনে যুগে যুগে বিশ্ব সাহিত্যে উদ্দেশ্যমূলক শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বৈকি। সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্যও তেমনিভাবে সদাসর্বদা জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতার ঘোষণা দেয়। সাহিত্যে মানবিক ও মাঙ্গলিক জীবনের বার্তা বহনের উদ্দেশ্যে তিনি বদ্ধপরিকর।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা দিক সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্ক আজ অব্দি চলমান। পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকালব্যাপী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকা রেডিও-টিভিতে 'বঙ্গবন্ধু' কিংবা 'জয় বাংলা' উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধাপরাধীরা পুনর্বাসিত হয়েছিল সসম্মানে। সিনেমা-নাটকে বীরাঙ্গনাদের আত্মহত্যার মাধ্যমে তাদের 'লজ্জিত' জীবনের পরিসমাপ্তি দেখানো হতো। সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ আড়াল করে কেবল স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে মনোযোগ আটকে দেওয়ার মতো নানা কৌশল অবলম্বন করেছে স্বাধীনতার বিরূদ্ধ শক্তি। এমত পরিস্থিতিতে আলেখ্যধর্মী সাহিত্যে উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাসের বয়ান যত বেশি বিবৃত করা যাবে, পরবর্তী প্রজন্মের বিভ্রান্তি দূরীকরণ তত বেশি কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

রোকসানা চৌধুরী সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ। rokhsana777@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড*, অনন্যা ২০০৩ ঢাকা
২. সেলিনা হোসেন, *যুদ্ধ*, সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৮ ঢাকা
৩. সেলিনা হোসেন, *মাটি ও শস্যের বুনন*, সময় প্রকাশন ২০০৭ ঢাকা
৪. সেলিনা হোসেন, *কাঠ কয়লার ছবি*, মাওলা ব্রাদার্স ২০০১ ঢাকা
৫. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, মাওলা ব্রাসার্স ২০০৭ ঢাকা
৬. সেলিনা হোসেন, *ঘুমকাতুরে ঈশ্বর*, মাওলা ব্রাদার্স ২০০৪ ঢাকা
৭. সেলিনা হোসেন, *গেরিলা ও বীরাঙ্গনা*, প্রথম ২০১৪ ঢাকা
৮. রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য ২০১২ ঢাকা
৯. সেলিনা হোসেন, *ভাষা মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতি* ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ২০১৩ ঢাকা
১০. তপোধীর ভট্টাচার্য, সেলিনা হোসেন : ঘুমকাতুরে ঈশ্বর : আখ্যানের দেশকাল মাত্রা, *গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা*, চন্দন আনোয়ার (সম্পাদনা) ২০১৫ ঢাকা
১১. নীলিমা ইব্রাহীম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, জাগৃতি প্রকাশনী ২০১৩ ঢাকা
১২. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা ২০১৫ ঢাকা
১৩. আয়শা খানম, *বাংলাদেশের নারী আন্দোলন প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ঐতিহ্য ২০০৯ ঢাকা
১৪. আসমা পারভীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন ২০১৪ ঢাকা